Rajshahi University journal of arts & law Vol. 50 (2022) pp. 121-138
ISSN 2309-0898

বাংলাদেশের শিল্প-সমালোচনায় চিহ্নিত আধুনিকতার খোঁজে নান্দনিকতার নীতি পর্যালোচনা [A Review of Aesthetic Principle in Search of Modernity in Art Criticism of Bangladesh]

শাহমান মৈশান*

Abstract

The current scenario of art in Bangladesh has been inherited from the Neo-Bengal School of art that was a direct outcome of the process of cultural colonisation in the subcontinent during the British Raj. Simultaneously, critical reception has evolved in responding to modern art practices since its beginning in the colonial era. Arguably, the notion of modernity has become a dominant phenomenon in critiquing art in this region. This research aims at investigating critically how the idea of modernity both as a cultural and epistemological phenomenon has been defined, discussed and appropriated in criticism of art in Bangladesh. This essay concentrates on the three selected critics to explore what meaning they have formed through their reading of modernity in the artworks since the partition of the sub-continent.

Keywords: Art, Aesthetics, Modernity, Modernism, Criticism, Colonialism, Post-colonialism and Bangladesh.

১. ভূমিকা

সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়নের প্রক্রিয়া এবং কলকাতাকেন্দ্রিক নব্য-বঙ্গীয় স্কুলের মাধ্যমে সূচিত শিল্পশিক্ষার পরম্পরায় বর্তমান বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পকলার মানচিত্র নির্মিত হয়েছে। ১৯৪৭ সালে প্রশাসনিক বিউপনিবেশায়নের মাধ্যমে ভারতবর্ষের বিভক্তির পর এই শিল্পচর্চার প্রতি বিবিধ বিদগ্ধ সাড়া লক্ষ্য করা যায়। তাই ঔপনিবেশিক আমলের পরম্পরায় সমালোচনামূলক চিন্তার ধারাও বেগবান হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের শিল্পচর্চার মূল পাটাতন অর্থাৎ ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক একটি প্রপঞ্চ হিসেবে 'আধুনিকতা' ধারণাটি বাংলাদেশের শিল্প-সমালোচকগণ কীভাবে চিহ্নিত করেছেন– সেই প্রক্রিয়া অনুসন্ধানের লক্ষ্যে এই প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। বাংলাদেশের শিল্পকলায় আধুনিকতা কী এবং কীভাবে তা চিহ্নিত হয়েছে সেটি খুঁজে দেখার লক্ষ্য নিয়ে প্রথমেই এই লেখা বুঝতে চাইবে আধুনিকতার মর্মার্থ কী? আধুনিকতার মর্ম তালাশ করতে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে অনুসন্ধান করা হবে ঐতিহাসিক ও দার্শনিক পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিকতার উদ্ভব ও এর ধারণাগত অর্থ। তারপর, বাংলাদেশের শিল্পকলা ও এর বিভিন্ন ঘরানার সমালোচনা ব্যবচ্ছেদ করার প্রয়োজনে বোঝার চেষ্টা করা হবে এদেশের ঔপনিবেশিক ইতিহাস ও অভিজ্ঞতার সূত্রে আধুনিকতা কী? আবার এই প্রেক্ষাপটের অন্তঃসলিলাস্বরূপ ভারতবর্ষীয়/দক্ষিণ এশীয় সমালোচনা-পদ্ধতির প্রাচীন রূপরেখা কী তাও অবধারণের চেষ্টা করা হবে। এবং এর সঙ্গে সমন্বিত করে মনোনিবেশ করা হবে আধুনিক সমালোচকের কাজ কী তা অনুধাবনে। এই সামগ্রিক পটভূমি উন্মোচনের প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের তিনজন নির্বাচিত সমালোচকের শিল্পচিন্তা নিরীক্ষা করে এই প্রবন্ধ সন্ধান করবে বাংলাদেশের শিল্পের আলোচনায় আধুনিকতা ধারণাটি কীভাবে ও কী অর্থে সাব্যস্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত ইংরেজি বইয়ের সকল উদ্ধৃতি প্রবন্ধকার নিজে ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ

* সহকারী অধ্যাপক, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। E-mail: smoishan@yahoo.com

করেছেন মাতৃভাষায় জ্ঞানচর্চার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে গড়ে ওঠা সংঘবদ্ধ প্রয়াসে যুক্ত হওয়ার সচেতন আকাঙ্ক্ষায়।

২. আধুনিকতা এবং ঔপনিবেশিকতা: যুক্তি, ব্যক্তি ও জ্ঞানের রাজনীতি

মডার্নিজম বইয়ে পিটার চাইল্ডস 'আধুনিকতা'কে 'একটি স্খলিত ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরিভাষা' হিসেবে প্রস্তাব করেন। আধুনিকতার উদ্ভবকে তিনি ইতিহাসের আলোকে পাঠ করে অবহিত করেন: 'পাশ্চাত্যের ইতিহাসের রেনেসাঁ [পুনর্জাগরণ] পর্ব থেকে এর বিস্তার। অথবা এমনও বলা হয় যে, সতেরো শতকের গ্যালিলিও [১৫৬৪-১৬৪২], হবস [১৫৮৮-১৬৭৯], নিউটন [১৬৪২-১৭২৬], লেইবনিজ [১৬৪৬-১৭১৬] ও দেকার্তের [১৫৯৬-১৬৫০] মাধ্যমে সূচিত বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের কাল থেকে [এর বিকাশ]' (Childs 2000:16)। ক্রিটিকাল বাগ্‌ধারা হিসেবে আধুনিকতাকে পাঠ করতে গিয়ে চাইল্ডস অন্য সমালোচকদের ভাবনার সারাৎসার তুলে ধরে বলেন, আঠারো শতকের এনলাইটেনমেন্ট (আলোকায়ন) যুগ-ই বস্তুত আধুনিকতার উদগাতা। এনলাইটেনমেন্টের দার্শনিক ভিত্তির প্রতি চাইল্ডস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন: 'কার্যকারণমূলক যুক্তি দিয়ে প্রকৃতি ও সমাজের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের মাধ্যমে এই যুগের যে অগ্রযাত্রা ঘটে, তখন থেকেই ন্যায়বিচার, নৈতিকতা, নিয়ন্ত্রণ, সংগঠন, বোঝাপড়া ও সুখের চাবিকাঠি হয়ে উঠেছে যুক্তি (র‍্যাশনালিটি)' (Childs 2000:16)।

অন্যদিকে, মারশাল বেরমান, আধুনিকতাকে পাশ্চাত্য ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে মানবীয় কর্মকাণ্ডের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে, আধুনিকতার তিনটি কালিক পর্ব চিহ্নিত করেছেন। প্রথম পর্ব ১৫০০ থেকে ১৮০০ সাল অবধি 'যখন মানুষ আধুনিক জীবনকে প্রকাশ করতে উপযুক্ত ভাষা খোঁজার সংগ্রামে লিপ্ত'; দ্বিতীয় পর্ব ১৮০০ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ 'সমগ্র উনিশ শতক ব্যাপি আমেরিকান ও ফরাসি বিপ্লবের পর থেকে ইউরোপজুড়ে বিরাট বিরাট উত্থানের ঘটনাবলী'; তৃতীয় পর্ব ১৯০০ থেকে পরবর্তী প্রায় এক শতাব্দী–'এই কালপর্বে প্রায় সমগ্র বিশ্বই আধুনিকায়নের প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে যায়' (উদ্ধৃত Childs 2000:16)।

কালানুক্রমিক ধারা অনুযায়ী পুরাতন ইতিহাসতত্ত্বের আলোকে আধুনিকতার ঠিকুজি খোঁজার এই প্রবণতাকে বিভিন্ন দার্শনিক পদ্ধতি নাকচ করে দেয়। যেমন, আঠারো শতকে ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) রচিত "হোয়াট ইজ এনলাইটেনমেন্ট" প্রবন্ধ পর্যালোচনা করতে গিয়ে বিশ শতকে মিশেল ফুকো (১৯২৬-১৯৮৪) লেখেন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ "হোয়াট ইজ এনলাইটেনমেন্ট"। এই প্রবন্ধে প্রতীয়মান হয়, ফুকো আধুনিকতাকে কোনো কালপর্ব হিসেবে গ্রহণ করেননি। ফুকোর চিন্তা অনুযায়ী, আধুনিকতা একটি 'অ্যাটিটুড' বা 'মনোভাব' (Foucault 1984: 37)। ফুকো বলেন, 'মনোভাব বলতে আমি বোঝাচ্ছি সমকালীন বাস্তবতাকে সম্পর্কিত করার একটি ধরন; কিছু নির্দিষ্ট লোকের স্বতঃপ্রবৃত্ত পছন্দ; মোদ্দা কথায় অনুভব ও চিন্তা করার একটি পন্থা...' (Foucault 1984: 37)। অধিকন্তু, ফুকোর মারফত কান্টকে পাঠ করে আধুনিকতা বিষয়ক সারগ্রাহী একটি রূপরেখার হদিস মেলে। কান্ট এনলাইটেনমেন্টকে চিহ্নিত করেন একটি প্রক্রিয়া রূপে যা (পাশ্চাত্যের) মানুষকে 'অপরিপক্বতা'র দশা থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারে। কান্টের এনলাইটেনমেন্ট দর্শন অনুযায়ী 'অপরিপক্বতা হলো আমাদের [অর্থাৎ পাশ্চাত্যের মানুষের] ইচ্ছার একটি নির্দিষ্ট অবস্থা। এই ইচ্ছাবস্থা আমাদেরকে অন্য কারো কর্তৃত্ব মেনে নেওয়ায় যা [আবার] আমাদেরকে এমন একটি ক্ষেত্রের দিকে পরিচালিত করে যেখানে [অবশ্যই] যুক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে' (Foucault 1984: 37)। ফুকো থেকে জানা যায় এই প্রস্তাব খোলাসা করতে কান্ট তিনটি উদাহরণ দেন: 'আমরা অপরিপক্বতার দশায় নিপতিত কারণ একটি বই আমাদের বোঝাপড়ার স্থান দখল করে নেয়, একজন আধ্যাত্মিক পরিচালক আমাদের বিবেকের স্থান দখল করে নেয়, একজন চিকিৎসক আমাদেরকে বলে দেয় আমরা কী খাব না খাব' (Foucault 1984: 34)। ফুকো মনে করেন, ইচ্ছা, কর্তৃত্ব ও যুক্তির ব্যবহারের সঙ্গে (পাশ্চাত্য সমাজের) বিদ্যমান সম্পর্ক পরিমার্জনার মাধ্যমে কান্ট এনলাইটেনমেন্টকে সংজ্ঞায়িত

করেছেন। পরিবর্তন সাধনের সূত্র হিসেবে এনলাইটেনমেন্ট মানুষকে 'দিকনির্দেশনা' দেয়: 'জানতে ভয় পেও না, জানার জন্য সাহসী হও, হও উদ্ধত' (Foucault 1984: 34)। কান্টের ভাবনা পর্যালোচনা করে ফুকো সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন যে, 'ফলশ্রুতিতে এনলাইটেনমেন্টকে অবশ্যই গণ্য করতে হবে একদিক থেকে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে যাতে মানুষ যৌথভাবে অংশ নেয়; এবং অন্যদিক থেকে একটি নির্ভীক ক্রিয়া রূপে যা ব্যক্তিগতভাবে সুসম্পন্ন হয়' (Foucault 1984: 34)। অতএব, ফুকোর কান্ট-পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়, আধুনিক মানবজাতি একটি যুক্তি-ব্যবস্থার অধীন। যুক্তি প্রয়োগের দুটি পরিসর রয়েছে—একটি ব্যক্তিগত, অপরটি সমষ্টিগত। আধুনিক ব্যক্তি 'অ্যা কগ ইন দ্য মেশিন'—একটি বিরাট যন্ত্র ব্যবস্থার ছোট খাঁজকাটা চাকার একটি খাঁজ মাত্র। আধ্যাত্মিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অর্থাৎ নৈতিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় যুক্তিশীল বিরাট সাংগঠনিক ব্যবস্থার অধীনে ও সাপেক্ষে ব্যক্তি যুক্তির চর্চার মাধ্যমে 'অপরিপক্বতার' দশা থেকে মুক্তি অন্বেষণ করে।

ইমানুয়েল কান্ট যেমন যুক্তির আলোকবর্তিকাস্বরূপ আধুনিকতাকে উদ্‌যাপন করেন, জুরগেন হেবারমাস (জ. ১৯২৯) তেমনি আধুনিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন। হেবারমাস বলেন, 'আলোকায়নের দার্শনিকগণ আঠারো শতকে আধুনিকতার প্রকল্প সূত্রবদ্ধ করেন। অন্তর্নিহিত যুক্তির আলোকে নৈর্ব্যক্তিক বিজ্ঞান, বিশ্বজনীন নৈতিকতা ও আইন এবং সার্বভৌম শিল্পকলা গড়ে তোলার [এই] প্রচেষ্টা [বস্তুত] দৈনন্দিন জীবনের যুক্তিসঙ্গত গড়ন নির্মাণের লক্ষ্যে' (উদ্ধৃত Childs 2000:17)। কিন্তু হেবারমাস মনে করেন '[একান্ত যুক্তিনির্ভর] আধুনিকতা একটি অসম্পূর্ণ প্রকল্প। কারণ এটি অগ্রসরই হয় নিজেকে নিজেই পুনঃসংজ্ঞায়িত করে' (উদ্ধৃত Childs 2000:17)। আধুনিকতার অন্তর্গত স্বরূপতাত্ত্বিক সমস্যা স্বচ্ছ হয় চাইল্ডস কর্তৃক উত্থাপিত তর্কে—

> সর্বোপরি আধুনিকতার প্রধান চরিত্র হলো সাধারণভাবে এটি মানবতাকে সবার ওপরে স্থান দেয়ার প্রচেষ্টা চালায় এবং বিশেষত মানবীয় যুক্তি-আশ্রয়ী বুদ্ধিকে – ধর্ম থেকে প্রকৃতি, অর্থ-ব্যবস্থা থেকে বিজ্ঞান – সবকিছুরই কেন্দ্রে স্থাপন করে। পুঁজি, সমাজ অধ্যয়ন ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উত্থানকে বিবৃত করতে আধুনিকতা বিশ্বাস স্থাপন করে প্রগতি ও উৎপাদনশীলতায়। [আধুনিকতা বিশ্বাস করে] এই প্রগতি ও উৎপাদনশীলতা-ই শিল্পায়ন, প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, প্রশাসন ও নজরদারির একটি গণ-ব্যবস্থা তৈরি করে (Childs 2000:17)।

বিপরীতে, আধুনিকতার নঞর্থক মাত্রাগুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে চাইল্ডস ব্যাখ্যা করেন—

> যুক্তি ও বিজ্ঞানের আধিপত্য বস্তুগত সুফল দিলেও, ব্যক্তির স্বায়ত্তশাসন বা উপকারী আত্মজ্ঞানের বিকাশ ঘটাতে পারেনি। এই জগৎ, এর ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক জীবন – এই জাতীয় কোনো কিছুকেই [তা] অর্থপূর্ণ করতে পারেনি। অন্যদিক থেকে বললে, সম্ভবত তা মানুষকে নিছক যুক্তিশীল প্রাণীতে পর্যবসিত করেছে...। দেখা গেছে মানুষ আরো জটিল। এমনকি, পর্যায়ক্রমে সে আবেগিকভাবে, মনস্তাত্ত্বিকভাবে ও প্রযুক্তিগতভাবে ক্রমশ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। তর্ক তুলে বলা যায়, মানবতা আবির্ভূত হয়েছে যার কোনো উদ্দেশ্য নেই। বরং মানবতাকে দেখা যায় পরিবর্তন ও রূপান্তরেরর জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে, শুধুমাত্র সাময়িক তুষ্টি বা অর্থ তৈরি হচ্ছে (Childs 2000:17)।

আধুনিকতার সমালোচকগণ মনে করেন, সমগ্র মানবজাতির পর্যায়ক্রমিক মুক্তির লক্ষ্যে বিশ্বজনীন প্রচেষ্টার নামে আধুনিকতার প্রকল্প যুক্তি ও জ্ঞানের নামে কেবল বিকল্প উপায়ে প্রাগাধুনিক সমাজকে দাস বানিয়ে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এর জন্য দমন, ধর্ম ও 'স্বাভাবিক' কর্তৃত্বের ধারণাকে কাজে লাগিয়ে সামাজিক আধিপত্য অর্জন করেছে (Childs 2000:16)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আধুনিকতার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভাষা হিসেবে ইউরোপীয় পুঁজির বৈশ্বিক সম্প্রসারণ ঘটেছে। এই সম্প্রসারণকে উত্তর-উপনিবেশবাদ 'সাম্রাজ্যবাদ' হিসেবে আখ্যায়িত করে। *ইম্পেরিয়ালিজম, দ্য হাইয়েস্ট স্টেজ অব ক্যাপিটালিজম* বইয়ে ভ্লাদিমির লেনিন (১৮৭০-১৯২৪) বলেছেন, পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে আর্থিক পুঁজি

(ফাইন্যান্স ক্যাপিটালিজম) 'একটি বৃহদাকার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পুঁজি' জন্ম দিয়েছে। লেনিনের মতে, এই টাকা তাদের নিজেদের দেশে লগ্নি করা লাভজনক ছিল না। কারণ সেখানে শ্রমশক্তি সীমিত। উপনিবেশগুলোতে পুঁজির অভাব থাকলেও শ্রম ও মানবসম্পদের প্রাচুর্য ছিল। তাদের পুঁজির বিকাশ ও প্রবৃদ্ধি টেকসই করতে তারা অ-শিল্পায়িত দেশগুলোকে অধীন করেছে। অতএব, লেনিনের মার্কসবাদী ব্যাখ্যার সূত্রে আধুনিকতাকে অনুধাবন করা যায় পুঁজির রাজনৈতিক অর্থনীতি ও সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ রূপে (Loomba 1998: 5)। আধুনিকতা ও ঔপনিবেশিকতার যোগসূত্র নিরূপণ করতে আনিয়া লুম্বা অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া, সামাজিক প্রক্রিয়া এবং জ্ঞানের পুনর্বিন্যাসের মধ্যকার পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ক পর্যালোচনা করেন। বিশেষ করে, এডওয়ার্ড সাঈদ (১৯৩৫-২০০৩) ও গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক (জ. ১৯৪২) প্রমুখের ভাবনা থেকে সারাৎসার আহরণ করে লুম্বা পাশ্চাত্য আধুনিকতার ঔপনিবেশিক ও পুরুষতান্ত্রিক মাত্রা উন্মোচন করেন। কারণ, ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্টের ডিসকোর্স তথা পাশ্চাত্যের মানবতাবাদী প্রকল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্ররূপে নিরন্তর জিজ্ঞাসু কর্তারূপী যে মানুষটিকে নির্মাণ করা হয়েছে তা আসলে 'একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ উপনিবেশ বিস্তারকারী' (Loomba 1998: 66)।

এডওয়ার্ড সাঈদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, লুম্বা কথিত 'শ্বেতাঙ্গ পুরুষ উপনিবেশ বিস্তারকারী' আধুনিক কর্তাশক্তি কেবল একতরফা জ্ঞান উৎপাদন করে না। উপনিবেশের অধীন সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিগুলো আত্মপরিচয়ের বহুমাত্রিক জটিল প্রক্রিয়াতে একইভাবে অংশ নেয়। যেমন, লুম্বা যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, ঔপনিবেশিক শাসনের অধীন বিভিন্ন সাহিত্যকর্ম নিছক প্রতাপশালী ভাবাদর্শকেই প্রতিফলিত করে না। বরং এগুলো উপনিবেশের সংস্কৃতির মধ্যে জারি থাকা বিরোধ-বিসম্বাদ, বিস্তর জটিলতা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রভেদগুলোও সংকেতায়িত করে (Loomba 1998: 70)। এর ফলে, উপনিবেশে আধুনিকতার চর্চায় লক্ষ করা যায় অনুকরণ (মিমিক্রি) ও সংকর (হাইব্রিডিটি) পরিস্থিতি। যেমন হোমি ভাভা বলেন, 'ঔপনিবেশিক উপস্থিতি সর্বদাই দোদুল্যমান। আসল ও কর্তৃত্বরূপী বহিরাবরণ এবং পুনরাবৃত্তি ও পার্থক্যরূপী উচ্চারণ – [এই দুয়ের] মধ্যে এটি বিভক্ত হয়ে থাকে' (উদ্ধৃত Loomba 1998: 177)। অন্যদিকে, ভাভার তত্ত্ব দিয়ে অনুপ্রাণিত –উনিশ শতকে কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলা নাটক তথা সাংস্কৃতিক চর্চার আধুনিকতার স্বরূপ সম্পর্কে– এক সমালোচনামূলক পর্যালোচনা প্রস্তাব করে:

> উনিশ শতকের বাংলার সাংস্কৃতিক আধুনিকতা হলো একটি বিচ্ছিন্ন কিন্তু প্রতাপশালী শ্রেণীর ক্ষমতা ও আভিজাত্যের অভিব্যক্তি। তাছাড়া, তৎকালীন বাংলায় আধুনিকতার আরো একটি বৈশিষ্ট্য হলো পাশ্চাত্যের/ইংরেজের জীবনবীক্ষণের ষোল আনা নকল। বলা বাহুল্য, বাংলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে লক্ষণীয় আধুনিকতা হলো কৃত্রিম আধুনিকতা। ... কলকাতায় বাবুদের [ভদ্রলোক শ্রেণির] নাটক থেকে প্রতীয়মান হয় (বিলাতি) ঔপনিবেশিকতা এবং (বঙ্গীয়) আধুনিকতা মূলত অবিচ্ছেদ্য। এই আধুনিকতা সাম্রাজ্যের কেন্দ্র থেকে প্রান্তে নকল সংস্করণ আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। ... যা ঔপনিবেশিকতা, আদতে তা-ই আধুনিকতা। সাম্রাজ্যবাদের ছদ্মবেশে প্রগতি ও যুক্তির মাহাত্ম্য বর্ণনা করে এটি বিশ্বজনীন এক সাংস্কৃতিক বাধ্যবাধকতা হয়ে ওঠে (মৈশান ২০২১)।

আধুনিকতার এই বাধ্যবাধকতামূলক রাজনীতিকে সমাজতাত্ত্বিক আলাঁ তোরেইঁ সমালোচনা করেন। তিনি মনে করেন, আধুনিক ব্যক্তি-মানুষ নিজেকে কর্তাশক্তিতে রূপান্তরিত করে প্রতিনিয়ত নানা বন্ধন থেকে মুক্ত হতে নিরন্তর সংগ্রামে লিপ্ত থাকে (Touraine 1995)।

এই পর্যালোচনা থেকে আধুনিকতা বিষয়ক কিছু সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করা সম্ভব। প্রথমত, আধুনিকতা ও ঐতিহাসিকতা পরস্পর সম্পর্কিত। কারণ, আধুনিকতার একটি ইতিহাস রয়েছে। যদিও এই ইতিহাসের ভূগোল ইউরোপ, তথাপি উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের ঘটনা একে বৈশ্বিক প্রপঞ্চে পরিণত করেছে। এই বৈশ্বিক ইতিহাসের কর্তারূপে যুক্তিশীল ব্যক্তি-মানুষের আবির্ভাব নিশ্চিত হয়েছে। ফলে, ব্যক্তির

স্বায়ত্তশাসনের পরিধি এক মৌলিক প্রশ্নে পরিণত হয়েছে। কার্যকারণভিত্তিক যুক্তির নীতিতে তৈরি সামষ্টিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে স্বায়ত্তশাসিত ব্যক্তির নৈতিক ক্রিয়ার সম্পর্কটি আধুনিক রাষ্ট্র, সমাজ ও বিবিধ সংগঠনের কাঠামো ও কার্যকে সংজ্ঞায়িত করছে। যুক্তি, প্রগতি ও কল্যাণের মানবকেন্দ্রিক এক মহাবয়ান তৈরি হয়েছে। আধুনিকতার রাজনৈতিক অর্থনীতি সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়ন, এমনকি বিশ্বায়নেও অনুঘটকের ভূমিকা রেখেছে। আধুনিকতা ও ঔপনিবেশিকতার এই রসায়নে পুজিঁ, জ্ঞান ও ক্ষমতা অনুশীলনের বহুবিচিত্র জটিল অসমসত্ত্ব এক মিশ্র ক্ষেত্র সর্বত্র তৈরি হয়েছে। আধুনিকতা উদ্ভাবিত হয়েছে, উদ্‌যাপিত হয়েছে, প্রচারিত হয়েছে, আরোপিত হয়েছে, আত্মস্থ হয়েছে, মোকাবিলা হয়েছে, প্রতিরোধে পড়েছে। বিশেষত, বাংলাদেশের ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক বাস্তবতায় আধুনিকতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় নানা সংশ্লেষ ও অসমসত্ত্ব বিবিধ যৌগ তৈরি হয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশের সংস্কৃতি, সৃষ্টিশীলতা ও শিল্পকলার মানচিত্র এই প্রেক্ষাপটেই বিশেষভাবে গঠিত। আধুনিকতার ঐতিহাসিক-দার্শনিক-জ্ঞানতাত্ত্বিক-রাজনৈতিক প্রভাবেই ১৯৪৭-উত্তর পূর্ববাংলা (পূর্ব পাকিস্তান) এবং ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের চিত্রকলার শিল্পভাষা নতুন নতুন বাঁক নিয়েছে, এমনকি আত্মপরিচয়ের রাজনৈতিক-নান্দনিক প্রকল্প হাজির করেছে। পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে, এই জটিলতাপূর্ণ জ্ঞানতাত্ত্বিক ধারণা 'আধুনিকতা'কে প্রধান প্রত্যয়রূপে বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশের শিল্পসমালোচনার একটি পাঠ উপস্থাপন করা হবে।

বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিল্পসমালোচক রয়েছেন। তাঁরা অদ্যাবধি জীবনে ও কর্মে সক্রিয় রয়েছেন বিধায় তাদের কাজের উত্তরোত্তর ব্যাপ্তি কামনা করে এই প্রবন্ধের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বরং প্রয়াত তিনজন শিল্প-সমালোচকের – সাঈদ আহমদ (১৯৩১-২০১০), সন্তোষ গুপ্ত (১৯২৫-২০০৪) ও বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (১৯৩৬-২০২০) – কাজকে এই লেখায় প্রধানভাবে অবলম্বন করা হয়েছে। এই তিনজন সমালোচক এই পৃথিবীতে তাদের কর্মমুখর জীবন যাপন করে প্রস্থান করেছেন। ফলে, তাদের সমালোচনার ভুবন একটি পূর্ণ অবয়বে বর্তমানে ধরা দিতে সক্ষম। তাছাড়া, আধুনিকতার পাটাতনে উপরোক্ত তিনজন সমালোচকের আশ্রয় নেবার কারণ হলো বিরাজমান ধারায় নানারকম অপব্যাখ্যা ও ভুলপাঠ এড়িয়ে শিল্পালোচনার ডিসকার্সিভ ধারায় অংশ নিয়ে জ্ঞানচর্চা জারি রাখা। অধিকন্তু, এই পর্যালোচনায় প্রতিজ্ঞা প্রমাণের জন্য বিচার-প্রণালীগত সন্দেহ করার নৈয়ায়িক শর্তে অপরাপর সমালোচনামূলক কাজকে অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি। এক্ষেত্রে যেমন উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত প্রয়াত কবি ও সমালোচক সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২) রচিত *শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য* বইয়ের কথা বলা যায়। এতে যেমন তিনি শিল্পী এস এম সুলতান সম্পর্কে লিখেছেন–

> তাঁর [সুলতানের] লক্ষ্য হচ্ছে অমাদের গ্রামের সমাজজীবনকে উপস্থাপন করা। অত্যন্ত বলিষ্ঠ-দেহী কৃষককুল অথবা কৃষকরমণী, কৃষিকর্মে নিযুক্ত প্রাণী, উর্বরা ভূমি এবং বলিষ্ঠ ধানের মঞ্জরী সব কিছুকে একাকার করে তিনি একটি সজীবতার উত্তরণ খুঁজেছেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে এ সজীবতা হচ্ছে আমাদের কাম্য সুতরাং তিনি কাম্যের প্রসাদকে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। অবশ্য এখানে মনে রাখতে হবে বাস্তবদৃশ্য আমাদের গ্রামাঞ্চলে এ সজীবতাকে উদ্ঘাটন করে না (আহসান ২০০৪: ২৩৪)।

বাস্তবকে আলী আহসান কেবল চর্মচক্ষু দিয়ে দেখা উপরিতলের কাণ্ডকীর্তি হিসেবেই গণ্য করেছেন। এক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, শিল্পীর রূপকল্প, শিল্পের কনটেক্সট (প্রতিবেশ) এবং ব্যক্তি ও সমাজের ইতিহাস, বাস্তব ও সত্য অবধারণের বহুমাত্রিক সম্ভাবনা আলী আহসানের সমালোচনায় সম্পূর্ণ গরহাজির। ফলস্বরূপ, নান্দনিকতার ভাষা সৃষ্টির বিচিত্র শর্তের সাথে শিল্পকর্মের সম্পর্ক উন্মোচন না করে

উদ্ভট মন্তব্যধর্মিতা হয়ে ওঠে সমালোচনার নামান্তর। অথচ টেরি ইগলটন বলেন, 'সমালোচকের কাজ হলো মুখ থেকে মুখোশ খুলে ফেলা' (Eagleton 1988: 172)। অর্থাৎ বুদ্ধিগ্রাহ্য পদ্ধতিতে শিল্প ও সৃজনশীলতার রহস্য ও চিহ্নগুলোর পাঠের লক্ষ্যে সমালোচক শিল্পকর্মের আবরণ ও আভরণ সরিয়ে অন্তর্গত সত্য উন্মোচনের কাজ করেন। সুতরাং, আধুনিকতার খোঁজে, 'অ্যাফরিজম' বা সুভাষিতকরণ এড়িয়ে, মূল্যবিচারী শিল্প-সমালোচনার আলোকিত ক্ষেত্রে বিচরণের লক্ষ্যেই সাঈদ আহমদ, সন্তোষ গুপ্ত ও বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের ডিসকোর্সকে এই লেখার অভিমুখ নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩. আধুনিক সমালোচনা এবং স্থানীয় প্রাচীন জ্ঞানতত্ত্ব

বাংলাদেশের শিল্পকলায় আধুনিকতা কী এবং কীভাবে তা চিহ্নিত হয়েছে সেটি তলিয়ে খুঁজে দেখতে প্রথমেই আমরা বুঝতে চাইব সমালোচনামূলক পরিমণ্ডলে আধুনিকতার মর্মার্থ কী? এই প্রশ্ন নিয়ে অগ্রসর হলে দেখা যায় যে, আধুনিকতাস্বরূপ 'নতুন'কে প্রধান প্রত্যয় ধরে নিয়ে জার্মান দার্শনিক ওয়াল্টার বেনজামিন (১৮৯২-১৯৪০) ফরাসি আধুনিক কবি ও সমালোচক শার্ল বোদলেয়ার (১৮২১-১৮৬৭)-এর 'ফ্ল্যানুর' ধারণা বিশ্লেষণে অগ্রসর হন। বোদলেয়ারের ফ্ল্যানুর একই সাথে পর্যবেক্ষক ও ভোক্তা রূপে বিরাট শহর ঘুরে বেড়িয়ে পরিবর্তন ও পণ্যায়ন মোকাবিলা করে হয়ে ওঠে 'দ্য পেইন্টার অব মডার্ন লাইফ' বা আধুনিক জীবনের অঙ্কনশিল্পী। যদিও আধুনিকতার রূপ গভীরভাবেই দ্ব্যর্থবোধক। বেনজামিনের সমালোচনার সূত্রে আধুনিকতার লক্ষণ ফুটে ওঠে যখন বোদলেয়ার তাঁর *লে ফ্লর দ্যু মাল* কবিতায় ব্যক্ত করেন সেই নান্দনিক প্রয়োজনীয়তা যাতে দেখা যায় 'নতুন কিছু খোঁজার লক্ষ্যে অজানার গভীরে নিমজ্জন'। এমনকি, শিল্পী মানেঁর কাজে এবং পাশ্চাত্যের বিভিন্ন আভাঁগার্দ শিল্পান্দোলনে উদ্বোধিত হয়েছে আধুনিকতার মূল সূত্র 'ট্র্যাডিশন অব দ্য নিউ' বা 'নতুন ধারা' (Macey 2000: 260-261)। অন্যদিকে, স্বয়ং বোদলেয়ার 'দ্য পেইন্টার অব মডার্ন লাইফ' নামের প্রবন্ধে আধুনিকতাকে তুলে ধরেন আধুনিক জীবনের রূপায়িত বৈশিষ্ট্য হিসেবে। বোদলেয়ারের সমালোচনা অনুযায়ী এই রূপায়ণে ফুটে ওঠে সৌন্দর্য ও বর্তমান সময়। তাঁর মতে, সৌন্দর্য দুই প্রকার: সামান্য (জেনারেল) ও বিশেষ (পার্টিকুলার)। বিশেষ সৌন্দর্যকে তিনি চিহ্নিত করেন পরিস্থিতির সৌন্দর্য ও জীবনাচারের রেখাচিত্র বা স্কেচ হিসেবে। তাঁর মতে, শিল্পীরা নিজেদের বর্তমান সময়কে রূপায়ণ করেন আর এর মাধ্যমে আমরা যে আনন্দ আহরণ করি তা কেবলমাত্র সৌন্দর্যের জন্য নয়, এটি বর্তমানের অপরিহার্য গুণকে তুলে ধরার কারণেও। এই বর্তমান সময় বিশেষভাবে ধরা পড়ে প্রাত্যহিক জীবন-পরিস্থিতি ও জীবনাচারের রূপায়ণে (Baudelaire 1965:1)। ফলে, বোদলেয়ারের তত্ত্বমতে, আধুনিক শিল্পী তাঁর নিজের সময়ের জীবনাচারকেই রূপায়ণ করেন। আধুনিকতার এই রূপায়ণের সৃজনশীল প্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি বলেন, শিশুর সারল্য ও বিস্ময়াভিভূত এক পরিপ্রেক্ষিত থেকে আধুনিক শিল্পী তার কাগজে বাহ্য দুনিয়ার পুনর্জন্ম দেন যা প্রকৃতি থেকেও অধিকতর প্রাকৃত, সুন্দর থেকেও অধিকতর সৌন্দর্য্যমণ্ডিত। ফলে, আধুনিক শিল্পে ব্যক্ত হয় স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনায় গঠিত জীবন, যে-জীবন এর স্রষ্টার আত্মার মতোই। শিল্পে নিজের কালের উপরোল্লিখিত জীবনকে রূপায়ণ করতে এক নিরন্তর খোঁজে ছুটে চলে; এই ছুটে চলায় শিল্পী যা খোঁজেন তাকেই বোদলেয়ার আখ্যায়িত করেন 'আধুনিকতা' (Baudelaire 1965:12)। বোদলেয়ার বলেন, 'আধুনিকতা বলতে আমি বোঝাচ্ছি ক্ষণস্থায়ী, ফেরারি, শর্তসাপেক্ষ, শিল্পের অর্ধাংশ যার অপরাংশ চিরন্তন ও ধ্রুব' (Baudelaire 1965:13)। অতএব, ফুকোর চিন্তা অনুযায়ী আধুনিকতা যদি একটি মনোভাব হয় এবং কান্টের এনলাইটেনমেন্ট দর্শন অনুযায়ী অপরিপক্বতার দশা অতিক্রমের জন্য জন্য ব্যক্তি-মানুষের ক্রমশ জানার যদি বাধ্যবাধকতা থাকে, তাহলে বোদলেয়ারের সমালোচনা অনুযায়ী বলা যায়, সেটি প্রতিফলিত হচ্ছে শিল্পীদের নিজের কালের নতুনত্ব অনুসন্ধানে গভীরে নিমজ্জনের বিশেষ ক্রিয়ায়।

এই ভাবনা অনুযায়ী, বাংলাদেশের শিল্পে আধুনিকতাস্বরূপ এই 'নতুনত্বের' চিহ্ন কী অর্থে ও কোন প্রণালীতে তিনজন শিল্প-সমালোচকের কাজে চিহ্নিত হয়েছে সেই বিচারের প্রণালীতে যেমন পাশ্চাত্যের আধুনিক যুক্তিগ্রাহ্য পদ্ধতিতে নির্মিত 'ক্রিটিক' বা সমালোচনার কাঠামো আত্মস্থ হয়েছে, তেমনি বাংলা তথা দক্ষিণ এশিয়ার প্রাচীন জ্ঞানতত্ত্ব অনুযায়ী দর্শনগত বিচার-প্রণালীরও বিচ্ছুরণ অনুধাবিত হয়েছে। বাংলাদেশের শিল্প-সমালোচনার পদ্ধতিগত কাঠামোতে আধুনিকতার একটি সংকরায়িত ও সংশ্লেষাত্মক অভিব্যক্তি তৈরি হয়েছে যেখানে কেবল পাশ্চাত্য নয় স্থানীয় ভাবধারাও সমালোচকগণ অজ্ঞানেই সাঙ্গীকরণ করেছেন। বাংলা অঞ্চলের স্থানীয় জ্ঞানতত্ত্বের ধারণা পাওয়া যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) রচনাবলীতে। তাঁর মারফতে জানা যায়–

> [সম্রাট] অশোকের সময় কথাবস্তু নামে একখানি বৌদ্ধদের বিচারগ্রন্থ লেখা হয়। উহাতে বিচার করিয়া বৌদ্ধদের সমস্ত মত স্থাপন করা হয়। ... উহার বিচার-প্রণালী বিচিত্র। ... একটা কথা উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে অনেক ফেকড়ি উঠিল, সব ফেকড়ি উদ্ধার করিয়া তবে মূলকথার বিচার হইল। মীমাংসকদের বিচার-প্রণালী আর একরকম। ১. সন্দেহ। ২. বিষয়। তাহার পর পূর্বপক্ষ, তাহার পর উত্তর। তাহার পর নির্ণয়। এই পাঁচটির নাম অধিকরণ। কিন্তু মহাযানীরা ঠিক ইংরাজি সিলজিসম (syllogism) মতো কথা কহিত, উহাতে বিচারটা বেশ পরিষ্কার হইয়া যাইত (শাস্ত্রী ২০০০: ৩৪২)।

বাংলাদেশে শিল্পের আধুনিকতার বিচারে সাঈদ আহমদ, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ও সন্তোষ গুপ্ত কী পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন সেটিকে বুঝবার জন্য এ অঞ্চলের সনাতন জ্ঞান-প্রণালীর সাথে মিলিয়ে আমরা পাঠ করতে পারি। তখন দেখা যাবে সাঈদ আহমদ দিঙ্নাগ প্রবর্তিত তিনটি অবয়বের মধ্যে প্রতিজ্ঞা পেশ করেছেন ও প্রয়োজনীয় উদাহরণ দিয়েছেন। সবসময় হেতু নির্দেশ করেননি। এই প্রণালীতেই সাঈদ নান্দনিকতার নীতিমালা প্রয়োগ করেছেন সমালোচনায়। আধুনিকতাস্বরূপ বাংলাদেশের শিল্পকলায় নতুনত্ব খোঁজ করতে গিয়ে সন্তোষ গুপ্তের সমালোচনায় মীমাংসকদের বিচার-প্রণালীর সাযুজ্য দেখা যায়। তিনি প্রথমে সন্দেহ পোষণ করেন। তারপর মূল বিষয় উত্থাপন করেন। এরপর আলোচনা বিস্তারের মাধ্যমে উত্তর নির্ণয় করেন। এই প্রণালীতে বিষয়ের পর্যালোচনার ভাবাদর্শ হিসেবে মার্কসবাদী পদ্ধতির স্থানীয়করণের আশ্রয় নেন। *কথাবস্তুর* অন্তর্গত বিচার-প্রণালী অনুযায়ী একটা 'কথা' তুলে, এর সঙ্গে অনেক 'ফেকড়ি' জুড়ে সব ফেকড়ি উদ্ধারের পর তবে মূলকথার বিচারে ব্রতী হন বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। বি কে জাহাঙ্গীর অনেকটা মহাযানী ও ইংরেজি সিলজিসম প্রণালীর মিশ্রণে সমাজতাত্ত্বিক শ্রেণি ও উত্তর-ঔপনিবেশিক চৈতন্য সন্ধানে মনোনিবেশ করেন তাঁর শিল্প-সমালোচনায়। এ পর্যায়ে, নিচের অনুচ্ছেদগুলোতে সাঈদ আহমদ, সন্তোষ গুপ্ত ও বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর বাংলাদেশের শিল্পের আলোচনায় নতুনত্বস্বরূপ আধুনিকতা বলতে কী বক্তব্য প্রদান করেছেন তা আলোচনা করা হবে।

৩.১ সাঈদ আহমদ: নান্দনিকতার আঙ্গিক ও আধুনিকতার দেশ-বিদেশ

বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পের আলোচনা যাকে আমরা তিনটি তাৎপর্যপূর্ণ বর্গের মাধ্যমে চিহ্নিত করতে পারি। প্রথম বর্গে দেখতে পাওয়া যায় নান্দনিকতার বিধিমালাকে সমালোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় রূপে গ্রহণ করে শিল্পের মূল্য বিচারের প্রচেষ্টা। সৌন্দর্যের রাজনীতি অস্বীকার করে, গড়নবাদী (ফরমালিস্ট) অবস্থান থেকে বাংলাদেশের আধুনিক নন্দন চিহ্নিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন সাঈদ আহমদ। মূর্তকরণ (ফিগারেশন) ও বিমূর্তকরণ (অ্যাবস্ট্রাকশন) –এই দুই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সাঈদ চল্লিশের দশক থেকে সূচিত বাংলাদেশের চিত্রশিল্পে আধুনিকতার দুটি মূল স্রোত অবলোকন করেন। সাঈদের সমালোচনায় চিহ্নিত এই দুই স্রোতে প্রবহমান দুটি বিভেদমূলক প্রবণতার একটি হলো ঐতিহ্যের প্রতি একদল শিল্পীর আনুগত্য এবং অন্যটি হলো ঐতিহ্যের প্রতি আরেকদল শিল্পীর অস্বীকার।

সাঈদ আহমদ স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে সক্রিয় শিল্পীদের প্রবণতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন: "পূর্ব পাকিস্তানি [বাংলাদেশের] শিল্পীদের কাজে দুটো ভিন্ন প্রবণতা দেখা যায়, একটি হলো লোকশিল্পের ঐতিহ্য দিয়ে অনুপ্রাণিত শিল্প এবং অন্যটি এর সম্পূর্ণ বিপরীত যা হলো বিমূর্ত শিল্প। ঐতিহ্যবাদীরা রং ও প্রতীক ব্যবহার করেছেন তাঁদের স্বভাববাদী কাজকে অলঙ্কৃত করতে এবং ঐতিহ্যবিরোধীরা গ্রহণযোগ্য ভৌগোলিক সীমানা ভেঙেছেন..." (Ahmed 2012: 342)। এখানে লক্ষ করা যায় যে, জাতীয়তাবাদী চেতনা ও লোকশিল্পের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের মধ্যকার একটি সম্পর্ক সন্ধানরত শিল্পীদের কাজের ধরন বিশ্লেষণের মাধ্যমে সাঈদ বাংলাদেশের চিত্রকলায় আধুনিকতা চিহ্নিত করেছেন। তাঁরা ছিলেন (ফিগারেটিভ) মূর্তিধর্মী শিল্পী। এই বয়োজ্যেষ্ঠ শিল্পীদের সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ হলো: 'যে প্রশিক্ষণ তাঁরা (বয়োজ্যেষ্ঠ শিল্পীরা) নিয়েছিলেন, যে পারিপার্শ্বিকতায় তাঁরা বেড়ে উঠেছিলেন ও যে পরিবর্তনশীল সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতভাগ) তাঁরা মোকাবিলা করেছিলেন সেগুলোই তাদের মনকে আকৃতি দিয়েছে ওই নির্দিষ্ট ধারায় গভীরভাবে প্রবেশ করতে। ... মূলত তাঁরা ছিলেন দেশমুখী' (Ahmed 2012: 342)।

শিক্ষণপ্রণালী, পরিপার্শ্ব ও বেড়ে ওঠার বাস্তবতার বিভিন্ন শর্ত তাদের কাজে আধুনিকতার মাত্রা যোগ করেছে এবং সাঈদ অন্তিম বিচারে তাদেরকে 'ইনওয়ার্ড লুকিং' অর্থাৎ ঘরমুখী শিল্পী হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁরা আধুনিক কিন্তু দেশমুখী। এ কারণেই তাঁদের কাজে দেশাত্মবোধক চেতনা অতি সক্রিয় থেকে ঐতিহ্যের মধ্যে সমকালীনতার ভাষ্য খুঁজে ফিরেছে। অন্যদিকে, বিমূর্ততায় নিবেদিত সেই সময়কার 'তরুণ অভিযাত্রিক' শিল্পীদের আধুনিক মনোভঙ্গি চিহ্নিত করতে সাঈদ তাঁদেরকে 'আউটওয়ার্ড লুকিং' অর্থাৎ বহির্মুখী বা বিশ্বমুখী শিল্পী আখ্যা দিয়ে জানাচ্ছেন:

> এই শিল্পীরা [হামিদুর রাহমান, আমিনুল ইসলাম, মুর্তজা বশীর, রশিদ চৌধুরী প্রমুখ] বিশ্বের বিভিন্ন শিল্প-রাজধানী থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ঢাকায় নতুন জ্ঞান নিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা প্রস্তুত ছিল নতুন ভাবনা শুষে নিতে, রক্ষণশীলতা থেকে দূরে থাকতে এবং নতুন পরিপ্রেক্ষিত দেখতে। এই তরুণ ও গতিশীল গ্রুপটি [এদেশের] শিল্পে একটি শক্তিশালী কম্পন সৃষ্টি করেছিল (Ahmed 2012: 343)।

রক্ষণশীলতা পরিহার করে এই শিল্পীরা এমন সব আইডিয়া নিয়েছিলেন যেগুলো চিন্তা-উদ্দীপক নিরীক্ষাধর্মী কাজের উদ্ভব ঘটিয়েছে। অতএব, সাঈদের বিশ্লেষণের সূত্রে, আমরা বাংলাদেশের শিল্পের আধুনিকতার দ্বিতীয় মাত্রার উদ্ভবের হেতু হিসেবে, নির্বস্তুকতা-ভিত্তিক নিরীক্ষাধর্মিতাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে পারি।

বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পের দুই মাত্রার শিল্পীদের কাজের পদ্ধতি ও ধ্যান-ধারণাকে বিচার করতে সাঈদ শিল্পীদের শিক্ষা এবং বিষয়বস্তুর "ডিলিং" ও "ট্রিটমেন্ট" অর্থাৎ বিষয়ের ধরন ও প্রয়োগকে মাপকাঠি ধরে "ইয়াং আর্টিস্টস-৭৭" নামের প্রদর্শনীর ব্রোশিয়রে লেখেন:

> জ্যেষ্ঠ শিল্পীরা শিল্পের জগতে চল্লিশে দশকের শেষের দিকে (ভারতবর্ষ ভাগের আগে) যাদের উত্থান আঙ্গিক ও রং নিয়ে নিরীক্ষা করেছিলেন দেশের লোকশিল্পের ঐতিহ্য থেকে তারা অনুপ্রেরণা নিয়েছিলেন। তারা শ্রেণীকক্ষে বঙ্গীয় চিত্র ঘরানা ও ব্রিটিশ পেইন্টারদের অবদান সম্পর্কেই বেশি শিখেছিলেন। কিন্তু পঞ্চাশের দশকে তরুণ ও বিশ্বমুখী শিল্পীদের গ্রুপটি ওই কক্ষপথে না গিয়ে বরং বেপরোয়াভাবে আন্দোলিত ছিল মধ্য-পঞ্চাশ দশকের ইউরোপ-আমেরিকার নতুন ভাবধারাকে তারিফ করতে (Ahmed 2012: 345)।

সাঈদ আাহমদের এই বর্গভিত্তিক বিশ্লেষণে আমরা দেখতে পাই প্রথম প্রজন্মের শিল্পীরা রং ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে ঐতিহ্য-আশ্রয়ী, যে-ঐতিহ্য আউটার-সেল্ফ বা সমাজের বহির্বাস্তবতার সাথে ব্যক্তিসত্তার চিরাচরিত যূথবদ্ধ সম্পর্কের বাইরের রূপ অন্বেষণকেই বিধিবদ্ধ করেছে। অন্যদিকে, দ্বিতীয় প্রজন্মের আধুনিক

শিল্পীরা শিল্পাদর্শে কলকাতা আর্ট স্কুল কেন্দ্রিক বঙ্গীয় ঘরানা ও প্রতিরূপায়ণের (রেপ্রিজেন্টেশন) ব্রিটিশ আদর্শের বিরোধিতায় সংলিপ্ত হয়। এই লিপ্ততার মাধ্যমে প্রথম প্রজন্মের শিল্পীরা ইউরো-আমেরিকান বড় অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিত ও মধ্য-পঞ্চাশের বিদ্রোহী চেতনার সংশ্লেষ ঘটাতে সক্ষম হয়। এর ফলে, সাঈদ আহমদের সমালোচনা অনুযায়ী, বাংলাদেশের শিল্প আধুনিকতার এমন এক চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য অর্জন করে, যেখানে ব্যক্তির 'অন্তর্গত সত্তার ঘনিষ্ঠ অবলোকন' নিরীক্ষিত হয়। আধুনিকতার এই বিশেষ নিরীক্ষা-পর্বটিকে সাঈদ আখ্যা দিচ্ছেন এই বলে যে, "এটা ছিল নিবিড় কাজের, গণমাধ্যমের, বহির্বিশ্বে ভ্রমণের ও নতুন নতুন আইডিয়া তালাশের সময়" (Ahmed 2012: 345)।

সাঈদ বাংলাদেশের শিল্পে আধুনিকতার তৃতীয় মাত্রার উদ্ভব হিসেবে মুক্তিযুদ্ধোত্তর শিল্পীদের কাজের বৈশিষ্ট্যের প্রতি আলোকপাত করতে গিয়ে বলেছেন:

> ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান যখন বাংলাদেশ হয় এর পরপরই শিল্পান্দোলনের পরের অধ্যায় শুরু হয়। ... এই শিল্পীরা [শহীদ কবির, হাসি চক্রবর্তী, মনসুরুল করিম, বীরেন সোম, আব্দুস সাত্তার, কে.এম.এ কাইয়ুম, শাহাবুদ্দিন, স্বপন চৌধুরী, কালিদাস কর্মকার প্রমুখ] রূপায়িত করেছেন একটাই স্মরণীয় অভিজ্ঞতা – মুক্তিযুদ্ধের বেদনা ও ত্রাস। তাঁরা রং ও আঙ্গিক নিয়ে নিরীক্ষার মাধ্যমে সাম্প্রতিক অতীতের লুট ও ক্ষতির চিহ্ন অতিক্রম করতে মনোনিবেশ করেছিলেন। এর ফলাফল হিসাবে কখনো কখনো দেখা যায় পরিস্ফুট মুখাবয়ব, আবার কখনো কখনো স্পন্দমান রঙের অল্প কিছু ছোপ অথবা খসখসে বুননে স্পন্দমান জমিন। তাঁরা বাস্তবতার জটিল স্বভাবকে বিবৃত করতে নতুন পদ্ধতি ও উপকরণ ব্যবহার করেছেন (Ahmed 2012: 343)।

সাঈদের সমালোচনা থেকে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, স্বাধীনতাযুদ্ধের অভিঘাত বাংলাদেশের শিল্পে নতুনতর আধুনিকতার বোধ জাগিয়েছে, যেখানে অবয়ব ও নিরবয়ব – মূর্তি ও বিমূর্তি – দুটোই সহাবস্থান করে। ফলে বাংলাদেশের আধুনিকতার তৃতীয় মাত্রাকে বলা যায় মূর্তায়ন ও বিমূর্তায়নের সংশ্লেষ। সাঈদের ভাষায়, এই কালপর্বের শিল্পীরা 'ক্যানভাস গ্রাফিক্স ও ভাস্কর্যের বিস্তৃত আয়তনে' যেন 'নৈর্ব্যক্তিক বাস্তবতার ব্যক্তিক রূপকল্প' সৃষ্টির মাধ্যমে আধুনিকতার তৃতীয় অভিক্ষেপ ঘটিয়েছেন (Ahmed 2012: 346)।

৩.২ সন্তোষ গুপ্ত: মার্কসবাদী সমালোচনা পদ্ধতির নমনীয় আত্মীকরণ ও আধুনিকতার দ্বন্দ্ব

সন্তোষ গুপ্তকে মার্কসবাদী সমালোচনার পদ্ধতি অবলম্বন করতে দেখা যায়। মার্কসের তত্ত্বানুসারে সমাজের 'ভিত্তিকাঠামো' ও 'উপরিকাঠামো'র সম্পর্ক যে একরৈখিক নয় বরং দ্বান্দ্বিক, সেই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা না থাকার ভ্রান্তিজনিত সমালোচনার ধারাকে নিজের আলোচনার কেন্দ্রে এনে সন্তোষ বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পের বিশ্লেষণে মার্কসবাদী ঘরানার সমালোচনার ধারা বিস্তার করেছেন। শিল্পসমালোচনার পদ্ধতি, মনোভঙ্গি ও ভাবাদর্শ বিষয়ে আলোচনার প্রসার ঘটিয়ে সন্তোষ গুপ্ত ব্যতিক্রমী সমালোচক হিসেবে আবির্ভূত হন। বাংলাদেশের শিল্পের আধুনিকতার বিচারে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান জানার মাধ্যমে এদেশের শিল্পের অবগুণ্ঠন-বিদূরণের (ডিমিস্টিফিকেশন) অন্য তাৎপর্য বোঝা সম্ভব। কিন্তু সেই ঘরানার প্রণালী কীভাবে গড়ে উঠেছে এ বিষয়ক ভাবনা-চিন্তার হদিস নেওয়ার মাধ্যমে মার্কসবাদী সমালোচনা-পদ্ধতির প্রয়োগে আধুনিকতার পাঠ গ্রহণও বিশেষভাবে সম্ভবপর হবে।

শিল্পের কথা বইয়ের অন্তর্ভুক্ত "শিল্প সাহিত্য বিচারে আতিবাম ঝোঁকের স্বরূপ" নামের নিবন্ধে সন্তোষ গুপ্ত সতর্ক করে বলেছেন, 'মনে রাখতে হবে মানুষ চিরকালই শিল্পী। সামাজিক অবস্থান বণিকসভ্যতার পণ্যবাহী যুগে তাকে ক্রমেই মানবিকতা-বিযুক্ত করে চিত্রিত করতে আগ্রহী। মার্কসবাদের নামে ভাঁড়ামির পোশাকে আবৃত করে ... তামাশা দেখানোর প্রচেষ্টা চলছে। এভাবে উন্মার্গগামিতাকে বিপ্লবী চরিত্র

হিসাবে উপস্থিত করার চেষ্টা চলছে। শিল্পের তত্ত্ব হিসাবে কলাকৈবল্যবাদের সে কাপালিক সহচর' (গুপ্ত ২০১১: ৬২)। মার্কসবাদের ছদ্মবেশে থাকা কলাকৈবল্যবাদী একধরনের সমালোচনামূলক ধারার সমালোচনার মাধ্যমে তার বিষয় প্রসারিত হয়েছে। এমনকি, শিল্পের ভাষায় কৃত্রিম কায়দায় শ্রেণিসংগ্রামের চিহ্ন খোঁজার সমালোচকীয় ধরনের তীব্র সমালোচনা করে তিনি শিল্পের সত্যমূল্যের বিচারে শ্রেণিসংগ্রামবাদী সমালোচকদের সক্ষমতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন– 'শ্রেণীসংগ্রামের কথা না বললে তিনি জনগণের বিপক্ষ শিবিরে থেকে জনস্বার্থের বিরুদ্ধতা করেছেন, শিল্প সাহিত্যের এ ধরনের বিচার শুধু অমার্কসীয় নয়, সাধারণ মানদণ্ডে এ যাবৎ সমালোচনার যে ধারার সাথে পরিচিত, তারও সত্যমূল্য অনুধাবনে এরা কতটুকু সক্ষম সে প্রশ্ন দেখা দেয়' (গুপ্ত ২০১১: ৬১)।

'শিল্পসাহিত্যের বিচারে মার্কসীয় তত্ত্ব প্রয়োগে ইদানীংকালে বেশিরভাগ বুদ্ধিজীবী ঝুঁকে পড়েছেন' বলে সন্তোষ তাঁদের সমালোচনার মধ্যে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেনি–এই অভিমত রেখে তিনি তাঁদের সমালোচনার দুর্বলতা কোথায় তা চিহ্নিত করেন–'কিন্তু এই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা কী সে কথাটা তারা বলেন না' (গুপ্ত ২০১১: ৫৯)। ফলে, একটি সচেতন প্রয়াস থেকে সন্তোষ গুপ্ত এমন এক মার্কসীয় পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন যা অ্যাকাডেমিক মার্কসীয় সমালোচনা-পদ্ধতির অনুসারী নয়, বরং সন্তোষের সমালোচনার মধ্যে তাঁর অন্বিষ্ট 'নিজস্ব ধ্যান-ধারণা' সম্বলিত মূল্যায়ন খুঁজে পাওয়া যায়, যার মূল ভিত্তি আবার মার্কসীয় সমালোচনার নমনীয় পদ্ধতি, শিল্পের মূল্য বিচারের প্রয়োজনে এর মধ্যে স্থানীয় বাস্তবতা ও বৈশিষ্ট্য যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি শিল্পকে একটি নির্দিষ্ট সমাজের একটি নির্দিষ্ট ইতিহাসের ঘটনা-প্রবাহের দ্বান্দ্বিক বাস্তবতায় স্থাপন করে সমালোচনা করতে অগ্রসর হন।

"আমাদের সাহিত্য ও শিল্প সংস্কৃতির ধারা ও রূপান্তর প্রসঙ্গ" নামের এক নিবন্ধের উপসংহারে তিনি এমন ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন যার মধ্যে সন্তোষের সমালোচনার অভিলক্ষ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে– 'আমাদের দেশের সাহিত্য ও শিল্প-সংস্কৃতির রূপান্তর শুধু লেখনী বা তুলিতে আসবে না, আসবে এদেশের অর্থনীতির কাঠামো কোন ধারায় বিন্যস্ত হবে তার পটভূমিতে' (গুপ্ত ২০১১: ৮৬)। এর মাধ্যমে আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি যে, কোনো শিল্পের মূল্য বিচারের জন্য প্রয়োজন সেই শিল্প কোন অর্থনেতিক কাঠামোর মধ্যে উৎপাদিত হচ্ছে তা জানা। ফলে, অধিকাঠামোর চেয়ে ভিত্তিকাঠামোর রূপান্তরের মাধ্যমে শিল্পের রূপান্তর যদি সম্ভব হয় তাহলে সেই কাঠামোর বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন-ব্যবস্থার অন্তর্গত শিল্পেরও বিচার সম্ভব। সন্তোষ গুপ্তের এই আদর্শিক অবস্থানকে, আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে, শিল্প-সমালোচনার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পদ্ধতি বলা যায়, যার ভিত্তিমূলে রয়েছে মার্কসীয় পদ্ধতির বিশেষ উপাদান দ্বান্দ্বিক ইতিহাসবোধ। এই পদ্ধতির ভিত্তিতে সন্তোষ গুপ্ত এদেশের শিল্পের আধুনিকতা চিহ্নিত করতে প্রয়াস নেন। সন্তোষ কর্তৃক চিহ্নিত দুই প্রকার অআধুনিকতার কোনোটি আবার বহিরঙ্গে আধুনিক হলেও অন্তরঙ্গে, বা যার আধেয়, দেশজ। সাঈদ আহমদ যেমন দেশভাগ থেকে মুক্তিযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ের শিল্পকলাকে দুই ধরনের আধুনিকতার মাত্রায় চিহ্নিত করেছেন, সন্তোষ গুপ্তও একইভাবে দুটি ধারা চিহ্নিত করছেন। কিন্তু সাঈদের মতন সন্তোষ আধুনিকতার দুই মাত্রা নিয়ে নিঃসংশয় নন। বরং সন্তোষ আধার ও আধেয়কে আলাদা করেছেন বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ– এই মাপকাঠিতে। তিনি আধার অর্থাৎ বহিরঙ্গ বা ফরমকে আধুনিক আখ্যা দিচ্ছেন, কিন্তু বিষয়বস্তু আধুনিক নয় বলে একে দেশজ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি শিল্পের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের মধ্যে থাকা বিশেষ এক ধরনের দ্বান্দ্বিক আধুনিকতাও চিহ্নিত করেছেন। 'প্রকৃত' আধুনিকতা এবং 'দ্বান্দ্বিক' আধুনিকতার এই বিরোধের মনোভঙ্গিগত পার্থক্য হিসেবে লোকশিল্পকলার বা ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন ও ঐতিহ্যের প্রতি নিস্পৃহতাকে কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে সন্তোষ বলেন–

> আমাদের দেশে উপরোক্ত ধারা দুটির মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্র আজও প্রশস্ত নয়। তার কারণ রয়েছে যে, আমাদের শিল্পীদের জীবন-দর্শন মূলত বিপরীতধর্মী নয়। একটা অদৃশ্য ফল্গুধারার মতো সাদৃশ্য রয়েছে কোথাও। আর পূর্ববাংলার শিল্প আন্দোলনের জনক জয়নুল আবেদীনের শিল্পকলা যা আজও উচ্চকিত রেখেছে আমাদের চেতনার আয়োজন তা ছিল প্রথমাবধিই মাটির কাছাকাছি। তার সৌন্দর্য সৃষ্টির মূলে কাজ করেছে এদেশের কর্মরত মানুষের প্রতি ভালবাসা। স্বভাবতই রঙ ও আলোছায়া পরীক্ষা-নিরীক্ষারত তাঁর উত্তরসাধকদের মধ্যে তা অলক্ষে প্রবাহিত (গুপ্ত ২০১১: ৫৩)।

এমনকী, তিনি ইউরোপীয় আধুনিকতাবাদী বিভিন্ন শিল্পান্দোলনের সাথে বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পধারার পার্থক্য চিহ্নিত করে পর্যটনবাদী পুনরাবৃত্তির চক্রে আপতিত বলে এর সমালোচনাও করেছেন:

> ইউরোপে বিভিন্ন রীতিবাদের পিছনে সামাজিক শক্তি অলক্ষ্যে হলেও সক্রিয় ছিল। আর আমাদের দেশের দ্বন্দ্বটা ছিল এবং এখনও রয়েছে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে গোঁড়ামি আর মুক্তবুদ্ধির মধ্যে। সামাজিক ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রতিবাদ কিংবা জনজীবনের বিভিন্ন ধারাকে সাধারণভাবে দেখা হচ্ছে পর্যটকের মনোভাব নিয়ে। সুতরাং শিল্পীর নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষাই আসল হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেকক্ষেত্রে কিংবা বাস্তবচিত্র হিসাবে যা উপস্থিত করা হচ্ছে–যথা শ্রমজীবী, মানুষ, ভিক্ষুক কিংবা নকশিকাঁথার, এসব পুনরাবৃত্তির চক্র (গুপ্ত ২০১১: ৫৪)।

সন্তোষ শিল্পের আধুনিকতাকে প্রাচীনতার অনুকরণ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষারূপে বিবেচনা করে বাংলাদেশের শিল্পে অনুকৃত আধুনিকতার ত্রুটি নির্দেশ করেন– 'প্রাচীন শিল্পরীতির অনুকরণ থেকে মুক্তির তাগিদ আধুনিক চিত্রকলার জনক এখানে সেই অনুকরণ কি [বাংলাদেশের] আধুনিকতাকে সীমাবদ্ধ করছে না?' (গুপ্ত ২০১১: ১৪২)। এমনকি তিনি বাংলাদেশে আধুনিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্যসূচক বিমূর্ত শিল্পের উদ্ভবের সমস্যার দিকটিও চিহ্নিত করেন: 'সুতরাং এখানকার শিল্পীদের বিমূর্ত রীতিতে আঁকা ছবির পশ্চাতে কোনো আন্দোলন, কোনো দর্শন প্রত্যক্ষ প্রেরণা যোগায়নি (গুপ্ত ২০১১: ১৪১)। তবে এদেশের আধুনিক শিল্পের একটি পরিণত রূপ রয়েছে বলে মতামত দিয়ে সন্তোষ গুপ্ত এর নিবিড় বিশ্লেষণেও মনোনিবেশ করেন। যেমন আধুনিকতার পরিণত দিক তুলে ধরে তিনি অভিমত দেন যে, 'আমাদের দেশে চিত্রশিল্পের পরিণতরূপ, তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঝোঁকে প্রধানত আন্তর্জাতিকতামুখী। শিল্পরীতি আঙ্গিক, বিন্যাসের পরিকাঠামো ও উপকরণগত আয়োজন এবং মাধ্যম একদিকে লালন করেছে এই প্রবণতা। আবার অন্যদিকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবধারার সাথে সম্পৃক্তি ও সংঘাতে তা দেশের মানসিকতার সম্পূর্ণ না হলেও একাংশকে অবারিত করেছে অর্থাৎ তাকে প্রকাশের সীমানায় টেনে এনেছে (গুপ্ত ২০১১: ১৩১)।

সন্তোষ গুপ্তের মতে, মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়ে সামাজিক আলোড়নের অন্তর্গত প্রাণশক্তি আপন ভুবনের খোঁজে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। সাঈদ যেমন এ পর্বের আধুনিকতার বিচারে কেবল নান্দনিক প্রকৃতি ও প্রবণতার দিকে নিবিষ্ট, সেখানে সন্তোষ এর একটি সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে আধুনিকতার অন্তর্গত লক্ষণ বিচারে তৎপর হয়েছেন। এক্ষেত্রে সন্তোষের ভাষ্য প্রণিধানযোগ্য–

> [মুক্তিযুদ্ধের] ফলে আধুনিক শিল্পীমানস বহির্মুখী থেকে অন্তর্মুখী হয়। অপর দিকে যুদ্ধশেষে বহু শিল্পী দেখলেন যে তাদের গুটিয়ে নেয়ার কালপর্বের প্রতি সমাজমানস উদাসীন। ফলে খুব দ্রুত শিল্পীদের একাংশ আত্মমগ্নতার মধ্যে চৈতন্যের মুক্তির সন্ধানে ব্যাপৃত হলেন। ঐতিহ্য সন্ধানী ধারার পাশাপাশি বিমূর্ত শিল্পরীতির বিভিন্ন অঙ্গিকের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। ... স্বাধীনতার পর ইউরোপীয় চিত্রকলার বিভিন্ন রীতি পদ্ধতি ও আঙ্গিক আরও ব্যাপকভাবে আমাদের শিল্পীদের শিল্পকর্মে লক্ষণীয়ভাবে চোখে পড়ে। ইউরোপ দুটি মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী ও পরবর্তীকালে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও মূল্যবোধের বিপর্যয়ে শিল্পীচিত্ত ছিল উন্মোচিত, তেমনি একটা পরিস্থিতি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শিল্পীচিত্তে আশার উত্তুঙ্গতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা শিল্পীর মনোভুবনকে আন্দোলিত করে। এসময়

দেখা গেল ঝাঁটা, ছেড়াকাঁথা, উপেক্ষিত ও বর্জিত বস্তুনিচয় শিল্পীরা ব্যবহার করেছেন। কোলাজ রীতির এই আরোপিত ধারা অনেক বেশি শিল্পের অঙ্গনে এল। সম্মিলন ঘটানো হল ফটোগ্রাফির সঙ্গে। ফর্মের ভাঙচুর ও নতুন বিন্যাস সামাজিক অস্থিরতার প্রকাশ ঘটাল (গুপ্ত ২০১১: ১৩২-৩)।

মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী অস্থির আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণেই বাংলাদেশের শিল্পে এক নব্যধারার প্রবেশ ও বিকাশ প্রসঙ্গে সামগ্রিক মূল্যায়ন শেষে তিনি বলেন, ' ... এভাবে আমাদের চিত্রকলায় আভাগার্ড অথবা নব্যধারা প্রতিবাদ ও উল্লাসের সাথে স্থান করে নেয়' (গুপ্ত ২০১১: ১৩৩)।

আধুনিকতার লক্ষণ বিচারে সন্তোষ গুপ্তের সমালোচনায় লক্ষ করা যায়, তিনি মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে শিল্পীকে 'সোশ্যাল বিয়িং' বা আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সামষ্টিক প্রক্রিয়ার অধীন সত্তারূপে ভাবছেন যে সত্তা আবার সৃষ্টিশীল সংবেদনশীলতায় সক্রিয় হতে পারে নিজের শিল্পকর্মের মাধ্যমে। মার্কসবাদ, ভাবাদর্শ ও শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক পর্যালোচনায় ক্লিফ স্লটার যেমন বলেন, '[শাসকশ্রেণির] ভাবাদর্শের বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের সকল উপায়ই শিল্প-সাহিত্য অবলম্বন করে। যে কোনো মার্কসবাদী বিশ্লেষণের মূল লক্ষ্য হলো যে কোনো সৃষ্টিকর্মের ভাবাদর্শিক বিষয়বস্তুর উপর [শাসকশ্রেণির রাজনৈতিক] ভাবাদর্শিক প্রভাবের একটি ঐতিহসিক পাঠ হাজির করা' (Slaughter 1980: 212)। সন্তোষ গুপ্ত ভাবাদর্শ বিষয়ক তাত্ত্বিক আলোচনায় পদ্ধতিগতভাবে প্রবেশ না করলেও, ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট পর্বে দেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিন্যাসের সঙ্গে মিলিয়ে বাংলাদেশের শিল্পের আধুনিকতা বিচারে সচেষ্ট থেকেছেন।

৩.৩ বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর: সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি ও দেশজ আধুনিকতার স্বরূপ

জয়নুল আবেদিনের জিজ্ঞাসা অবলম্বনে বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর যে সমালোচনার জাল বুনেছেন তাতে দেখা যায় শিল্পের আধুনিকতার উন্মোচনে তিনি দেখাচ্ছেন কী করে এদেশের শিল্পে 'শ্রেণী ও সমাজের বোধ' জেগে উঠেছে (জাহাঙ্গীর ১৯৯০: ৩০)। বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পের প্রথম পর্বের শিল্পী জয়নুলের কাজ বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন কী করে এদেশের শিল্প 'শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বশীলতার সমস্যা' প্রতিফলিত করার মাধ্যমে 'রিয়ালিস্টিক ও ইম্প্রেশনিস্টিক চিত্রের ক্ষেত্রে একসার প্রশ্নের' উত্থাপন ঘটিয়েছে। এই সব প্রশ্নের জবাবও জয়নুলের কাজে রয়েছে বলে জাহাঙ্গীর আমাদের অবহিত করেন। প্রশ্নের উত্থাপন ও এর জবাবই যে আধুনিক জয়নুলের চোখ ও মানস তৈরি করেছে, সেবিষয়েও আমরা অবগত হই জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে। অধুনিকতার পরিগঠনে ক্রিয়াশীল এই প্রশ্ন ও জবাবকে চিহ্নিত করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'কৃষক শ্রেণী থেকে মধ্য শ্রেণীতে তাঁর [জয়নুলের] উত্তরণের মধ্যে ধরা দিয়েছে কলোনী কালের ধনতান্ত্রিক বিবর্তন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্রের ফ্রেমে কৃষকশ্রেণীর জীবন যাপন, পাকিস্তানী ঔপনিবেশিকোত্তর ধনতান্ত্রিক ফ্রেমে কৃষক শ্রেণী উদ্ভূত মুসলমান মধ্য শ্রেণীর সংস্কৃতি রচনার প্রয়াস এবং ঔপনিবেশিকোত্তর বাংলাদেশের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কৃষক শ্রেণী থেকে বিযুক্ত মধ্য শ্রেণীর অবস্থান' (জাহাঙ্গীর ১৯৯০: ৩০) কী এবং এর উত্তর নির্ণয় কীভাবে ঘটেছে তা-ই জয়নুল প্রতিরূপায়ণ করেন।

ঔপনিবেশিক সমাজ গঠনের দুটি মূল শ্রেণি যথা জমিদার-বুর্জোয়া এবং কৃষকশ্রেণির জাতিভিত্তিক রাজনৈতিক প্রোগ্রাম বনাম মধ্যযুগীয় পন্থানুসারী অসংগঠিত বিদ্রোহের নানানামাত্রিক বিরোধের প্রেক্ষাপটে অগ্রসর সামাজিক বাস্তবতায় কী করে শিল্পের র‌্যাডিকেল সম্ভাবনা এসেছে সেই প্রশ্নের মারফতে জাহাঙ্গীর চিহ্নিত করেছেন যে, আবেদিনের কাজে একটি শৈল্পিক ফর্ম বা আঙ্গিকের উদ্ভাবন ঘটেছে (জাহাঙ্গীর ১৯৯০: ৩৩, ৫৫)। জাহাঙ্গীরের বিশ্লেষণ অনুযায়ী বলা যায়, শিল্পী জয়নুল 'লোকজ ফর্ম ব্যবহার করেছেন, কিন্তু এই ফর্ম গ্রামীণ অভ্যাসজাত নয়, এই ফর্ম দেখে বাঙালি ঐতিহ্যের বোধ মনে তৈরি হয়, কিন্তু সে-ঐতিহ্যের মধ্যে বর্তমানের কৃষক জীবনের দুই ঔপনিবেশিক যন্ত্রণা তিনি প্রবিষ্ট করিয়ে দিয়েছেন' (জাহাঙ্গীর ১৯৯০: ৫৫)। সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি অনুসরণের ফলে শ্রেণি ও উত্তর-

ঔপনিবেশিকতাবাদী চৈতন্য জাহাঙ্গীরের সমালোচনাকে সাঈদ ও সন্তোষ থেকে আলাদা করেছে। সাঈদ আহমদ যেখানে ঐতিহ্যকে স্রেফ চিহ্নিত করে থেমে গিয়েছেন আর সন্তোষও সেটা মান্য করার পাশাপাশি পুনরাবৃত্তি বলে একে ক্রুটিযুক্ত মনে করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে এই দুই সমালোচকের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের পার্থক্য হলো তিনি আধুনিক শিল্পের প্রথম পর্বে কেবল নিরেট ঐতিহ্যই দেখেননি, কোনো অবস্থান থেকে ঐতিহ্যের সমালোচনাও করেননি, বরং ঐতিহ্যের আধুনিক রূপায়ণের মধ্যে যে ঔপনিবেশিক যন্ত্রণা রয়েছে তা ব্যতিক্রমীভাবে আবিষ্কার করেছেন। দ্বিতীয়ত, মূল্যায়ন করতে গিয়ে জাহাঙ্গীর বলেন, জয়নুলের কাজ 'সুন্দর ছবির বিপরীতে 'বাস্তব' জীবন তুলে ধরে' এবং তা 'ভাবালুতা অতিক্রম' করে ক্রমান্বয়ে 'বাস্তব'কে আদর্শায়িত করে (জাহাঙ্গীর ১৯৯০: ১৪)। এই তীক্ষ্ণ বক্তব্যের মাধ্যমে জাহাঙ্গীর প্রথম পর্বের শিল্পে এমন এক আধুনিকতার খোঁজ দিচ্ছেন যার মধ্যে নৈতিকতার বোধ সক্রিয়। অন্যদিকে, জয়নুলের শিল্পকর্মে বিশেষত নারীদেহের রূপায়ণ বিচারে জাহাঙ্গীরের বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশ পায়। যেমন তাঁর মতে, বাংলাদেশের শিল্পের প্রথমপর্বের আধুনিকতায় জেন্ডার-সংবেদনশীলতা নেই। জাহাঙ্গীর এর কারণ হিসেবে পিতৃতান্ত্রিকতার বশীভূত শিল্পীর চৈতন্যকে চিহ্নিত করেছেন। এবং সেই চৈতন্য-কর্তার শিল্পে নারী তাঁর সমুদয় সংগ্রামের বাস্তবতা থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়ে। এ কারণে প্রায়ই নারী হয়ে উঠেছে পুরুষতান্ত্রিক চোখে নির্মিত সৌন্দর্যের পাত্রী। অতএব, বাংলাদেশের শিল্পের সূচনাকালীন আধুনিকতা পিতৃতন্ত্র অতিক্রম করতে পারেনি। জয়নুল আবেদিনের শৈল্পিক জিজ্ঞাসার সূত্র সন্ধান করতে নিরত জাহাঙ্গীর বিশেষভাবে জানান,

> সমাজই যে শরীরকে লাশ করে তোলে এই বোধ বাংলাদেশের শিল্পে ছিল না। ... শরীর ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে লাশ হচ্ছে বারবার। এই কদর্যতা, কদর্যতা উৎসারিত পাশবতা কি করে চোখে মেনে নেয়া যায়? এই প্রশ্ন চিত্র শিল্পের মৌলিক প্রশ্ন, এর সূত্রপাত রেনেশাঁ থেকে? ... রেনেশাঁশিল্প শরীরকে আদর্শায়িত করেছে এবং পাশবতাকে ভঙ্গিতে পর্যবসিত করেছে (জাহাঙ্গীর ১৯৯০: ৮১)।

সমাজ ও শরীরের সম্পর্ক উন্মোচনের মাধ্যমে, বিশেষ করে আঠারো-উনিশ শতকের স্প্যানিশ আধুনিক শিল্পী গয়ার ছবির উদাহরণের সূত্রে, পাশ্চাত্য আধুনিকতার বোধ কীভাবে বাংলাদেশের প্রথম পর্বের আধুনিক শিল্পে সমীকৃত হয়েছে– জাহাঙ্গীরের সমালোচনা সেই পাঠ উপস্থাপন করে। অন্যদিকে, বাংলাদেশের শিল্পে আধুনিকতার বিচারের ক্ষেত্রে জাহাঙ্গীরের একটি কূটাভাষিক (প্যারাডক্সিক্যাল) অবস্থানও খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর *দেশজ আধুনিকতা: সুলতানের কাজ* বইয়ে। সুলতানের কাজ বিশ্লেষণের মাধ্যমে জাহাঙ্গীর দুই ধরনের আধুনিকতা চিহ্নিত করেন। একটি হলো 'আন্তর্জাতিক আধুনিকতা' ও অপরটি হলো 'দেশজ আধুনিকতা' (জাহাঙ্গীর ১৯৯৯: ১৪)। এক্ষেত্রে তাঁর সমালোচনায় আধুনিকতার বিশেষায়ণ ও নামকরণে একটি দোদুল্যমানতা লক্ষ করা যায়। দেশজ আধুনিকতাকে তিনি 'বিকল্প অধুনিকতা' হিসেবেও আখ্যা দিয়েছেন। তিনি সুলতানের শিল্পে আন্তর্জাতিক আধুনিকতার প্রত্যাখ্যান ও দেশজ আধুনিকতার সৃজন আবিষ্কার করেছেন। জাহাঙ্গীরের মতে, দেশজ আধুনিকতায় শিল্পী আপন ইতিহাসে ফেরার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এর ফলে, জাহাঙ্গীরের বর্গীকরণে দেশজ আধুনিকতার প্রধান গঠনমূলক উপাদান হয়ে ওঠে নস্টালজিয়া বা স্মৃতিকাতরতার বোধ। সুলতানের কাজের সূত্রে, সংস্কৃতি ও প্রকৃতির সম্পর্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমে জাহাঙ্গীর দেখিয়েছেন জমি হলো এমন এক বাস্তবতা যা একই সাথে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। এর সাথে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, খাজনা, মালিকানা, ভাগচাষ, উৎপাদন, বীজ, সেচ ও শ্রমের সম্পর্ক অত্যন্ত জাজ্বল্যমান। অথচ শহুরে শিল্প-সাহিত্যে জমি যে প্রক্রিয়ায় নিসর্গ বা নৈসর্গিক সৌন্দর্যে (সিনিক বিউটি) পরিণত হয়েছে একে জাহাঙ্গীর 'ঔপনিবেশিক আধুনিকতা' হিসেবেও বিবৃত করেন (জাহাঙ্গীর ১৯৯৯: ৫৭)। সর্বোপরি, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের সমালোচনায় বাংলাদেশের শিল্পের অন্তর্গত পরস্পর-বিরোধী 'ঔপনিবেশিক আধুনিকতা' ও 'দেশজ আধুনিকতা'–এই দুই ধরনের আধুনিকতার খোঁজ মেলে।

৪. উপসংহার

উপর্যুক্ত পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, পাশ্চাত্যের যুক্তিভিত্তিক অনুসন্ধান পদ্ধতি এবং বৌদ্ধ মীমাংসকদের বিচারপ্রণালীর সংশ্লেষে সাঈদ আহমদ, সন্তোষ গুপ্ত এবং বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পের নতুনত্ব চিহ্নিত করতে ব্রতী হয়েছেন। সাধারণত সংস্কৃতি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এবং বিশেষত শিল্পের সমালোচনায় সুভাষিতকরণের বিপরীতে সাঈদ, সন্তোষ ও জাহাঙ্গীরের সমালোচনার ধারা নতুন প্রশ্ন ও প্রস্তাব হাজির করে। বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পের নিরীক্ষণে, সাঈদ আহমদ নান্দনিকতার সৃজনকে রাজনীতির সম্পর্করহিত এক কল্পভাষা হিসেবে গ্রহণ করেন। সন্তোষ গুপ্ত শিল্প সৃষ্টির ঐতিহাসিকতা অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট কালের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রভাবকে তাঁর শিল্প-সমালোচনার সূচিমুখে পরিণত করেন। বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর অন্তর্জাতিকতা, ঔপনিবেশিকতা ও দেশজতার পারস্পরিক সম্পর্ক ও বিরোধের প্রেক্ষাপটে শ্রেণির ধারণাকে বিশেষভাবে প্রয়োগ করে বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পের সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনার ধারা নির্মাণ করেন। সাঈদ আহমদ, সন্তোষ গুপ্ত ও বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের সমালোচনার পর্যালোচনা থেকে প্রাপ্ত এই তিন প্রকরণের শিল্প-সন্দর্ভ বাংলাদেশের চিত্রশিল্পের কল্পভাষায় সৃজিত বাংলাদেশের যৌথ জীবনের অনুধাবনে নতুন বীক্ষণ প্রদান করে। কেননা ভিটগেনস্টাইনের দর্শন অনুযায়ী 'ভাষা কল্পনা করার অর্থ হলো জীবনেরই এক রূপ কল্পনা করা' (উদ্ধৃত Jameson 1983: viii)।

তথ্যসূত্র

আহসান, সৈয়দ আলী (২০০৪) *শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য*, ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী।

গুপ্ত, সন্তোষ (২০১১), *শিল্পের কথা*, ঢাকা: জ্যোৎস্না পাবলিশার্স।

জাহাঙ্গীর, বোরহানউদ্দিন খান (১৯৯০), *জয়নুল আবেদিনের জিজ্ঞাসা*, ঢাকা: মুক্তধারা।

---- (১৯৯৯) *দেশজ আধুনিকতা: সুলতানের কাজ*, ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।

মৈশান, শাহমান (২০২১) "সাহেব-বাবুর বৈঠকখানায় বাংলা নাটক: ঔপনিবেশিকতা ও আধুনিকতা", তর্ক বাংলা (অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা), ঢাকা। পড়ার তারিখ ১১ জুন ২০২২। লিংক: https://tarkabangla.com/content/20

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ (২০০০) *নির্বাচিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সাহিত্য ও সংস্কৃতি-চিন্তা*, সত্যজিৎ চৌধুরী ও বিজলি সরকার (সম্পাদক), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

Ahmed, Sayeed (2012) *Complete Works of Sayeed Ahmed*, Vol.2. edited by Hasnat Abdul Hye, Dhaka: Bangla Academy.

Baudelaire, Charles (1965) *The Painter of Modern Life and Other Essays*, Translated and edtited by Jonathan Mayne, London: Phaidon Press.

Childs, Peter (2000) *Modernism*, London & New York: Routledge.

Eagleton, Terry (1988) "Towards A Science of the Text" in K.M. Newtonn (K. M.), ed., *Twentieth Century Literary Theory: A reader*, London: Macmillan Press

Foucault, Michel (1984) "What is Enlightenment?" in Rabinow (P.), ed., *The Foucault Reader*, New York: Pantheon Books, pp.32-50.

Jameson, Fredric (1983) *The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act*, London and New York: Routledge.

Loomba, Ania (1998) *Colonialism/Postcolonialism*, London & New York: Routledge.

Macey, David (2000) *The Penguin Dictionary of Cirtical Theory*, London: Penguin Books.

Slaughter, Cliff (1980) *Marxism, Ideology & Literature*, London: The Macmillan Press.

Touraine, Alain (1995) *Critique of modernity*. Translated by David Macey. Oxford: Blackwell.